

## বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনের উপর কৃষিজমির খণ্ডীভবন ও বিলীয়মানতার প্রভাব

ইন্দ্রজিৎ কুণ্ড\*

**Abstract:** The agricultural sector in Bangladesh faces some new challenges in the twenty-first century. On the one hand, the pressure of population and the existing laws of inheritance lead to the fragmentation of holdings and, on the other hand, croplands deplete in an astonishing rate due to urbanization, industrialization, river erosion etc. Accordingly the existing land-man ratio declines gradually. Bangladesh would have to face tough time ahead to grow more food on less land. Since there virtually remains no scope for any horizontal expansion in agricultural production, the increased food production to feed the added population in the days to come becomes a serious threat to the agriculture in Bangladesh.

### ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এককভাবে কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাংলাদেশের স্থূল দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে কৃষি বিভিন্ন উপখাতের (শস্য, পশুসম্পদ, বন ও মৎস্য) সমন্বিত অবদান শতকরা প্রায় ২১.৯১ ভাগ (২০০৪-২০০৫) এবং দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৫১.৭ ভাগ (২০০২-২০০৩) কৃষিখাতে নিয়োজিত।<sup>১</sup> দেশের মোট রপ্তানীতে কৃষিজাত পণ্যের (কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা সহ) অবদান (২০০৪-২০০৫) শতকরা ৪.৯৫ ভাগ।<sup>২</sup> বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ৬৬% পরিবার কৃষিজীবী<sup>৩</sup> এবং স্বাভাবিকভাবেই কৃষিখাত অকৃষিজ পণ্য ও সেবা বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। ১৯৫০ এর দশকের পর হতে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি বলতে মূলত বোঝানো হয়েছে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হতে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর অব্যাহত গুরুত্বারোপ এবং কৃষি উৎপাদনকে এ লক্ষ্যে পরিচালিত করার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বিশ্বায়করভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬০ এর দশকের খাদ্য-ঘাটতির-দেশ বাংলাদেশ ১৯৯০ দশকের শেষপ্রান্তে এসে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবী করেছে, যার ফলে খাদ্য উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যা অনেকটাই তিরোহিত হয়েছে বলে আপাতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়েছে। কিন্তু একুশ শতকের সূচনালগ্নে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা অদূর

\* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সমগ্র কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ বিপর্যয় জন্ম দেবে এবং এ বিপর্যয়ের কিছু লক্ষণ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাসমূহের স্বরূপ উন্মোচন এবং সম্ভাব্য বিপর্যয়ের কারণ ও প্রতিকার অন্বেষণ করা।

### উপাত্তের উৎস ও প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ

বর্তমান প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত গৌণ (সেকেন্ডারী) উৎস হতে সংগৃহীত হয়েছে। গৌণ উৎসের মধ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত উপাত্তই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে। এসব উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও অন্য কোন সূত্রে এধরনের ব্যাপকভিত্তিক উপাত্ত না থাকায় সরকারি উপাত্তই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট গবেষণা গ্রন্থাদি ও পত্র-পত্রিকা উপাত্তের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সমগ্র কৃষিখাত হলেও এখানে কৃষির শস্য উপখাতকেন্দ্রিক আলোচনাই মুখ্যত প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো শস্য উপখাতের মধ্যে নিম্নোক্ত উৎপাদনসমূহ অন্তর্ভুক্ত করেছে: দানাদার খাদ্যশস্য (ধান, গম ইত্যাদি); আঁশ জাতীয় শস্য (পাট, মেসতা ইত্যাদি); বেভারিজ; ডাল; মসলা; তৈলবীজ; ফল; আখ ও শাকসবজি।<sup>৪</sup> অত্র প্রবন্ধে কৃষির অন্যান্য উপখাত যেমন- পশুসম্পদ, হাঁস-মুরগী, বন, মৎস ইত্যাদি বাদ দিয়ে শুধু শস্য উপখাতের বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ কারণে যে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি, জিডিপিতে অবদান, মূল্য সংযোজনের গুরুত্ব ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে শস্য উপখাত এখনো বাংলাদেশের কৃষির প্রায় নয়-দশমাংশ স্থান দখল করে আছে। এছাড়াও সম্ভব কারণেই বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে কৃষির সবগুলো উপখাতের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের সমগ্র আলোচনায় কৃষি উৎপাদন বলতে বোঝানো হয়েছে শস্য উৎপাদন এবং প্রাসঙ্গিকভাবেই ভূমি কাঠামো তথা কৃষিখামারের আকারকেন্দ্রিক ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষকস্ফুদ্র কৃষক, প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীন ইত্যাদি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে কৃষিজমির গুণগত মান ও উৎপাদিকা শক্তি একরকম না হওয়ায় কৃষিখামারের আকারকেন্দ্রিক এই বিন্যাস সর্বদা গ্রহণযোগ্য ও কাজিষ্কৃত ব্যাখ্যা প্রদানে সহায়ক নাও হতে পারে। কারণ সেচ সুবিধার আওতাধীন উচ্চফলনশীল তিনফসলী ক্ষুদ্র খামার কখনো সেচ সুবিধাবঞ্চিত একফসলী বৃহৎ খামার অপেক্ষা অধিক উৎপাদনক্ষম বলে বিবেচিত হতে পারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো<sup>৫</sup> আকারের ভিত্তিতে কৃষি খামারকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছে: ক্ষুদ্র খামার (.০৫-২.৫০ একর); মাঝারি খামার (২.৫০-৭.৫০ একর) এবং বৃহৎ খামার (৭.৫০+ একর)। অত্র প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়টিকে সহজতর ও অর্থবহ করার জন্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত খামারের প্রমিত আকারকে ভিত্তি হিসেবে ধরে জমির পরিমাণের নিরিখে পাঁচ ধরনের কৃষিখামার দেখানো হয়েছে; (ক) ভূমিহীন (০-০.৫০ একর); (খ) প্রান্তিক খামার (.৫০-১.৫০ একর); (গ) ক্ষুদ্র খামার (১.৫০-২.৫০ একর); (ঘ) মাঝারি খামার (২.৫০-৭.৫০ একর) এবং (ঙ) বৃহৎ খামার (৭.৫০+ একর)। ভূমিহীন গৃহস্থালীকে (landless household) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আবার তিন ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছে; (ক) ভূমিহীন-১ হচ্ছে সেই গ্রামীণ গৃহস্থালী যার মালিকানায় চাষ, বসতভিটা বা অন্য কোন



ধরনের জমি নেই; ভূমিহীন-২ হচ্ছে সেই গ্রামীণ গৃহস্থালী যার মালিকানায বসতভিটা ছাড়া অন্য কোন ধরনের জমি নেই; ভূমিহীন-৩ হচ্ছে সেই গ্রামীণ গৃহস্থালী যার মালিকানায বসতভিটা বাদে .৫০ একর পর্যন্ত চাষের জমি রয়েছে।<sup>১</sup> বর্তমান প্রবন্ধে খামার (farm) বলতে বোঝানো হয়েছে কোন গৃহস্থালীর (household) মালিকানাধীন মোট কৃষি জমির পরিমাণকে অর্থাৎ গৃহস্থালীর মালিকানাধীন মোট কৃষি জমির পরিমাণের ভিত্তিতে খামারের আকার নির্ধারণ করা হয়েছে। আর হোল্ডিং (holding) বলতে বোঝানো হয়েছে কোন নির্দিষ্ট জমিখণ্ডকে। অর্থাৎ একটি খামারের অধীনে অনেক হোল্ডিং থাকতে পারে। কোন খামারের আওতাধীন হোল্ডিংসমূহ (holdings) বিচ্ছিন্নভাবে এক বা একাধিক গ্রামে থাকতে পারে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ খামারের হোল্ডিংসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত (scattered) অবস্থায় রয়েছে।

### ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি বন্টন প্যাটার্ন, উত্তরাধিকার ও ভূমি ব্যবহার প্রসঙ্গটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গে আলোচনা ব্যতিরেকে পুরো আলোচনা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থে ভূমি সংস্কার বা ভূমিকেন্দ্রিক স্থায়ী ব্যবস্থাপনা শুরু হয় ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশরা বাংলাদেশের সনাতন কৃষি কাঠামোতে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটায়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫০ সালে *East Bengal Estates Acquisition and Tenancy Act of 1950* - এর মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ধৃত জমিদারী প্রথা কার্যত বিলুপ্ত হয়। এই আইনের ফলে কৃষিজমির উপর কৃষক তথা রায়তের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার, তালুকদার প্রমুখদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই আইনে পরিবার পিছু জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারিত হয় ১০০ বিঘা (৩৩.৩৩ একর)। কিন্তু জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হলেও আইনগত জটিলতা ও বিবিধ কায়েমী স্বার্থের কারণে যথেষ্ট পরিমাণ বা প্রত্যাশিত পরিমাণ উদ্ধৃত জমি পাওয়া যায়নি কিংবা প্রাপ্ত জমি যথাযথভাবে বণ্টিত হয়নি। পরবর্তীতে সেনাশাসক আইয়ুব খান *East Pakistan Ordinance No. XV 1961* - এর মাধ্যমে জমির সর্বোচ্চ সিলিং ৩৭৫ বিঘা (১২৫ একর) নির্ধারণ করেন, ফলে রায়তদের মধ্যে উদ্ধৃত জমি বন্টনের সম্ভাবনা বাস্তবিক অর্থেই তিরোহিত হয়।<sup>২</sup> স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ভূমি সংস্কার আইনে পরিবার পিছু জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারিত হয় ১০০ বিঘা, পাশাপাশি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়। কিন্তু উদ্ধৃত জমি তথা খাস জমির বন্টনেও এই ভূমি সংস্কার সফল হয়নি। কারণ তৎকালীন সময়ে ৫০ লাখেরও বেশি ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীর মধ্যে বন্টন-উপযোগী উদ্ধৃত জমি ছিল মাত্র ৪.৫ লাখ একরের মতো, যা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল।<sup>৩</sup> পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে সরকার জমির সর্বোচ্চ সিলিং ৭০ বিঘায় নামিয়ে আনে এবং সারাদেশে বাধ্যতামূলক সমবায় চাষাবাদ প্রচলনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে এ উদ্যোগ কার্যকর হয়নি।<sup>৪</sup> ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের মাধ্যমে জমির সিলিং ৬০ বিঘায় নামিয়ে আনা হয় এবং এ আইনে বর্গা চাষীর স্বার্থ রক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক চুক্তির বিধান সন্নিবেশিত হয়। তাছাড়া নিয়ম করা হয় যে বর্গা চুক্তি ৫ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং বর্গাচাষী ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমি চাষ করতে পারবে। কিন্তু বিবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে এই ভূমি সংস্কার আইনও



কার্যকর হয়নি।<sup>১০</sup> অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকৃতঅর্থে কোন ভূমিসংস্কার নীতিই পুরোপুরি কার্যকর হয়নি।

একটি বিষয় রাখতে হবে যে বিদ্যমান উত্তরাধিকার আইন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে কোন ধনী কৃষক পরিবারের পক্ষেই দীর্ঘদিন ধনী থাকা সম্ভব নয়। কারণ কৃষির যৎসামান্য উদ্বৃত্ত দিয়ে নতুন জমি ক্রয় করার মাধ্যমে তথা consolidation and concentration of land এর মাধ্যমে বৃহৎ খামারের অবস্থান ধরে রাখা খুবই কঠিন। শুধুমাত্র কৃষিবহির্ভূত আয় (ব্যবসা, চাকুরী, বৈদেশিক মুদ্রা, মহাজনী বা বন্ধকী ব্যবসা ইত্যাদি) দ্বারাই ধনী কৃষকরা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারে বা মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকরা তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। নতুবা সম্পত্তি ভাগের স্বাভাবিক নিয়মেই বৃহৎ খামারসমূহ ক্রমশ ক্ষুদ্র খামারে পরিণত হতে বাধ্য। এই বাস্তবতার কারণে বাংলাদেশে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে এতদিনের অনুসৃত সর্বোচ্চ সিলিং এর পরিবর্তে সর্বনিম্ন সিলিং এর বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি কৃষি জমি ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। নতুবা অর্থনৈতিকভাবে অকেজো খামারের (economically non-viable farm) সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় স্বীকার করেছে যে, দেশে বিদ্যমান ভূমিনীতি ও ভূমি আইনে অনেক দুর্বলতা রয়েছে এবং পাশাপাশি আইনের প্রয়োগ ও কার্যকারিতাও অনেক দুর্বল। বাংলাদেশে প্রকৃতঅর্থে ভূমি ব্যবহারের কোন সুস্পষ্ট আইন নেই।<sup>১১</sup>

### বাংলাদেশের কৃষির ভূমিবিণ্যাস প্যাটার্ন

বাংলাদেশের বর্তমান ভূমি মালিকানার ধরণ একটি বিশেষ ভূমিব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলশ্রুতি। বাংলাদেশের কৃষির ভূমিবিণ্যাস প্যাটার্নে (land distribution pattern) একটা অনন্যসাধারণ বা বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা এদেশকে সন্দেহাতীতভাবে একটি ক্ষুদ্র কৃষক অধ্যুষিত কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করেছে। ১৯৬০ এর দশকে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র কৃষকরা সংখ্যাগত দিক দিয়ে বেশি হলেও ক্ষুদ্র খামারের তাওতাধীন মোট জমির পরিমাণ মাঝারি ও বৃহৎ খামারের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণের চেয়ে কম ছিল। অথচ ১৯৯০ এর দশকের শেষ প্রান্তে ক্ষুদ্র কৃষকরা সংখ্যাগত দিক দিয়ে প্রাধান্য বিস্তারের পাশাপাশি ক্ষুদ্র খামারের অধীনস্থ জমির পরিমাণের দিক দিয়েও সুস্পষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ খামার ছিল মোট খামারের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৯.৮৭%, ১৭.৬১% ও ২.৫২% এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ খামারের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল মোট কৃষিজমির যথাক্রমে ৪১.১৮%, ৪১.৫০% ও ১৭.৩২% (সারণি ০১ দ্রষ্টব্য)। পাশাপাশি মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ও কৃষিখামারের গড় আয়তন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ খামারের গড় আয়তন ছিল যথাক্রমে ০.৮৭ একর, ৩.৯৯ একর ও ১১.৬১ একর, অথচ ১৯৭৭ সালে এ আয়তন ছিল যথাক্রমে ১.৩ একর, ৪.২ একর ও ১২ একর।<sup>১২</sup> ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ খামারসমূহের সংজ্ঞায়নে<sup>১৩</sup> ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, ফলে এখানে বৃহৎ খামার বলতে যে খামারকে বুঝানো হয় আয়তনের দিক থেকে তা পৃথিবীর অনেক দেশের বৃহৎ খামারের তুলনায় ছোট। এমনকি প্রতিবেশী দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের



বৃহৎ ও মাঝারি খামারের গড় আয়তন অনেক কম। ফলে বাংলাদেশের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনে বৃহৎ ও মাঝারি খামারসমূহের প্রভাব অত্যন্ত সীমিত। কৃষিজমির অব্যাহত খণ্ডীভবন, বিচ্ছিন্ন অবস্থান ও অকৃষিজ কাজে কৃষিজমির ব্যবহার বৃদ্ধি এক ভয়াবহ জটিল সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খামারসমূহ ক্রমশ অর্থনৈতিক বিচারে অলাভজনক খামারে (economically non-viable farm) পরিণত হচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষিতে ভূমিবিদ্যাস প্যাটার্নে ঘটমান দ্রুত পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার এবং অন্যদিকে প্রান্তিক চাষীদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপার্জন করার অসামর্থ্যতা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অব্যাহত চাপ এবং পাশাপাশি বিদ্যমান উত্তরাধিকার আইন কৃষিজমির অব্যাহত খণ্ডীভবনের জন্য দায়ী যা প্রকারান্তরে বিপুল সংখ্যক অলাভজনক খামারের জন্ম দিচ্ছে। ফলে এদেশের একদিকে ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে ধনী কৃষক ও মাঝারি কৃষকদের সংখ্যা ও প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক বিবেচিত হওয়ার পরও ক্ষুদ্র কৃষকরা তাঁদের যৎসামান্য কৃষিজমি আঁকড়ে গ্রামেই পড়ে থাকছে। মূলত অকৃষিখাতে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি না হওয়া, অকৃষিখাতের কর্মসমূহের অনির্ভরযোগ্যতা ও অস্থিরতা এবং শ্রমশক্তির অদক্ষতার কারণে গ্রামের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি গ্রামেই পড়ে থাকছে, যা প্রকারান্তরে কৃষিজমির খণ্ডীভবনকে ত্বরান্বিত করছে।

সারণি ০১: বিভিন্ন কৃষি খামারের শতকরা হার ও খামারভুক্ত জমির পরিমাণের শতকরা হার  
(১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৯৬)

| খামারের ধরন   | খামারের সংখ্যার শতকরা হার |         |       | খামারভুক্ত জমির পরিমাণের শতকরা হার |         |       |
|---------------|---------------------------|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|
|               | ১৯৭৭                      | ১৯৮৩-৮৪ | ১৯৯৬  | ১৯৭৭                               | ১৯৮৩-৮৪ | ১৯৯৬  |
| ক্ষুদ্র খামার | ৪৯.৭২                     | ৭০.৩৪   | ৭৯.৮৭ | ১৮.৭৫                              | ২৮.৯৮   | ৪১.১৮ |
| মাঝারি খামার  | ৪০.৮৫                     | ২৪.৭২   | ১৭.৬১ | ৪৮.৯০                              | ৪৫.০৯   | ৪১.৫০ |
| বৃহৎ খামার    | ৯.৪০                      | ৪.৯৪    | ২.৫২  | ৩২.৩৬                              | ২৫.৯২   | ১৭.৩২ |

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *The Bangladesh Census of Agriculture and Livestock, 1983-84, p-46; Statistical Pocketbook of Bangladesh 2000, pp-178-179*



বৃহৎ ও মাঝারি খামারের গড় আয়তন অনেক কম। ফলে বাংলাদেশের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনে বৃহৎ ও মাঝারি খামারসমূহের প্রভাব অত্যন্ত সীমিত। কৃষিজমির অব্যাহত খণ্ডীভবন, বিচ্ছিন্ন অবস্থান ও অকৃষিজ কাজে কৃষিজমির ব্যবহার বৃদ্ধি এক ভয়াবহ জটিল সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খামারসমূহ ক্রমশ অর্থনৈতিক বিচারে অলাভজনক খামারে (economically non-viable farm) পরিণত হচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষিতে ভূমিবিদ্যাস প্যাটার্নে ঘটমান দ্রুত পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার এবং অন্যদিকে প্রান্তিক চাষীদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপার্জন করার অসামর্থ্যতা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অব্যাহত চাপ এবং পাশাপাশি বিদ্যমান উত্তরাধিকার আইন কৃষিজমির অব্যাহত খণ্ডীভবনের জন্য দায়ী যা প্রকারণের বিপুল সংখ্যক অলাভজনক খামারের জন্ম দিচ্ছে। ফলে এদেশের একদিকে ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে ধনী কৃষক ও মাঝারি কৃষকদের সংখ্যা ও প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক বিবেচিত হওয়ার পরও ক্ষুদ্র কৃষকরা তাঁদের যৎসামান্য কৃষিজমি আঁকড়ে গ্রামেই পড়ে থাকছে। মূলত অকৃষিখাতে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি না হওয়া, অকৃষিখাতের কর্মসমূহের অনির্ভরযোগ্যতা ও অস্থিরতা এবং শ্রমশক্তির অদক্ষতার কারণে গ্রামের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি গ্রামেই পড়ে থাকছে, যা প্রকারণের কৃষিজমির খণ্ডীভবনকে ত্বরান্বিত করছে।

সারণি ০১: বিভিন্ন কৃষি খামারের শতকরা হার ও খামারভুক্ত জমির পরিমাণের শতকরা হার  
(১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৯৬)

| খামারের ধরন   | খামারের সংখ্যার শতকরা হার |         |       | খামারভুক্ত জমির পরিমাণের শতকরা হার |         |       |
|---------------|---------------------------|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|
|               | ১৯৭৭                      | ১৯৮৩-৮৪ | ১৯৯৬  | ১৯৭৭                               | ১৯৮৩-৮৪ | ১৯৯৬  |
| ক্ষুদ্র খামার | ৪৯.৭২                     | ৭০.৩৪   | ৭৯.৮৭ | ১৮.৭৫                              | ২৮.৯৮   | ৪১.১৮ |
| মাঝারি খামার  | ৪০.৮৫                     | ২৪.৭২   | ১৭.৬১ | ৪৮.৯০                              | ৪৫.০৯   | ৪১.৫০ |
| বৃহৎ খামার    | ৯.৪০                      | ৪.৯৪    | ২.৫২  | ৩২.৩৬                              | ২৫.৯২   | ১৭.৩২ |

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *The Bangladesh Census of Agriculture and Livestock, 1983-84, p-46; Statistical Pocketbook of Bangladesh 2000, pp-178-179*



সারণি ০২: বিভিন্ন কৃষি খামারের মোট সংখ্যা (হাজারে) [১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৯৬]

| খামারের ধরন   | ১৯৭৭ | ১৯৮৩-৮৪ | ১৯৯৬  |
|---------------|------|---------|-------|
| ক্ষুদ্র খামার | ৩১১০ | ৭০৬৬    | ৯৪২৩  |
| মাঝারি খামার  | ২৫৫৬ | ২৪৮৩    | ২০৭৮  |
| বৃহৎ খামার    | ৫৯০  | ৪৯৬     | ২৯৮   |
| মোট           | ৬২৫৭ | ১০০৪৫   | ১১৭৯৮ |

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *The Bangladesh Census of Agriculture and Livestock, 1983-84, p-46; Statistical Pocketbook of Bangladesh 2000, pp-178-179*

লক্ষণীয় যে, ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ এই দু'দশকে বাংলাদেশের কৃষির ভূমিবিন্যাস প্যাটার্নে খামারের সংখ্যার শতকরা হারের নিরিখে বৃহৎ ও মাঝারি খামারের প্রভাব দ্রুত হ্রাস পেয়েছে (সারণি ০২ দ্রষ্টব্য)। পাশাপাশি খামারের আওতাধীন জমির পরিমাণের নিরিখে যেখানে বৃহৎ খামারের আওতাধীন জমির পরিমাণ দু'দশকে প্রায় অর্ধেক নেমে এসেছে, সেখানে ক্ষুদ্র খামারের আওতাধীন জমির পরিমাণ বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি এবং মাঝারি খামারের আওতাধীন জমির পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস না পেলেও শতকরা হারের নিরিখে মাঝারি খামারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে (সারণি ০২ দ্রষ্টব্য)। কৃষিক্ষেত্রে অতি-জনসংখ্যার চাপ এবং কৃষিজমির অব্যাহত খণ্ডীভবনের ফলে বাংলাদেশে দুই দশকে মোট কৃষি খামারের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। সারণি ০২ হতে দেখা যায় যে, ১৯৭৭ সালে যেখানে মোট কৃষি খামারের সংখ্যা ছিল ৬২.৫৭ লাখ, ১৯৯৬ সালে তা হয়েছে ১১৭.৯৮ লাখ। ফলে কৃষি খামারের গড় আকারও অনেক কমে এসেছে। বিস্ময়করভাবে দু'দশকে ক্ষুদ্র খামারের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণেরও বেশি, ৩১.১০ লাখ হতে ৯৪.২৩ লাখ। কৃষিভূমির অব্যাহত খণ্ডীভবনের নীতি ফলাফল হচ্ছে দু'দশকে ৫৫.৪১ লাখ (১১৭.৯৮ লাখ - ৬২.৫৭ লাখ) নতুন খামার জন্ম নেয়া। এর পাশাপাশি ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অপ্রতিহত গতিতে। ১৯৫১, ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৯৫-৯৬ সালে ভূমিহীনদের হার ছিল যথাক্রমে ১৭%, ৫৬.৫% ও ৫৯.২১%।<sup>১৪</sup>

বাংলাদেশের কৃষি ভূমিবিন্যাস প্যাটার্ন ও কৃষিজমি ব্যবহারের (cropland operation) আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ভূমিমালিক-কাম-চাষীর (owner-cum-cultivator) সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং পাশপাশি ভাগচাষী বা বর্গাচাষীর (tenant/ sharecropper) এবং ভূমিমালিক-কাম-বর্গাচাষীর (owner-cum-tenant) সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ধারা। অধিকন্তু ভাগচাষের গতানুগতিক ধারার (উৎপাদিত ফসলের অংশ মালিক ও ভাগচাষীর মধ্যে বন্টন প্রক্রিয়া) মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন দৃশ্যমান হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে বা ভাড়ার বিনিময়ে ভূমিতে ফসল ফলানোর প্রবণতা বাড়ছে (fixed rental system)।<sup>১৫</sup> সারণি ০৩ হতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বেশির ভাগ ভূমি মালিকের নিজের জমি নিজেই চাষ করার প্রবণতা বাড়ছে এবং পাশপাশি ভাগচাষ প্রবণতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। এই প্রবণতার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হচ্ছে ভূমিহীনরা ক্রমাগত দিনমজুরে পরিণত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে ভাগচাষ প্রক্রিয়ার দীর্ঘদিনের আধিপত্য ক্রমশ অপসৃত হচ্ছে।



সারণি ০৩: কৃষিখামার চাষ ব্যবস্থাপনা (মোট খামারের শতকরা হার) [১৯৫১, ১৯৭৮, ১৯৯৬]

| ধরন                     | ১৯৫১ | ১৯৭৮  | ১৯৯৬  |
|-------------------------|------|-------|-------|
| ভূমিমালিক-কাম-চাষী      | ৪১   | ৬৪.৫৩ | ৬৬.২৩ |
| ভূমিমালিক-কাম-বর্গাচাষী | ৪৭   | ২৮.০৬ | ২৩.৫৯ |
| বর্গাচাষী               | ১২   | ৭.৪১  | ১০.১৮ |
| মোট                     | ১০০  | ১০০   | ১০০   |

সূত্র: Mosharraf Hossain, *Agriculture in Bangladesh*, p-131; BBS, *Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh 1998*, p-231 [Worked out from data given in the Yearbook]

বাংলাদেশের কৃষির ভূমিবিদ্যাস প্যাটার্নের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এখানে বৃহৎ খামার হিসেবে স্বীকৃত খামারসমূহ প্রতিবেশী দেশসমূহের বৃহৎ খামারের তুলনায় শুধু ছোটই নয়, খামারের আওতাভুক্ত জমি অনেক ছোট ছোট হোল্ডিং বা প্লটে বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন স্থানে বিন্যস্ত (scattered) যা যৌক্তিকভাবেই ছোট হোল্ডিং বা প্লটসমূহকে অর্থনৈতিক বিচার অলাভজনক খামারের পরিণত করে। এক হিসেবে দেখা যায় বাংলাদেশে খামারপিছু ছোট হোল্ডিং এর গড় সংখ্যা ৯.৬।<sup>১৬</sup> বাংলাদেশে বর্তমানে ৭.৫০ একরের খামারকে বৃহৎ খামার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়, অথচ ১৯৭২ সালের ভূমি সংস্কার আইন ৮.৩ একর (২৫ বিঘা) পর্যন্ত খামারকে ভূমি রাজস্ব প্রদান হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল, কারণ ২৫ বিঘা আয়তন পর্যন্ত খামারকে তখন উদ্বৃত্ত খামার হিসেবে মনে না করে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ খামার মনে করা হত। ১৯৭৭ সালের কৃষি শুমারী হতে দেখা যায় দুই-পঞ্চমাংশ খামারের ক্ষেত্রে ১০ এর অধিকবার খণ্ডীভবন হয়েছে এবং এক-চতুর্থাংশ খামারের ক্ষেত্রে এ খণ্ডীভবন হয়েছে ৬ বার থেকে ১০ বার। কৃষিজমির এই অব্যাহত খণ্ডীভবনের প্রভাব সম্পর্কে Azizur Rahman Khan and Mahbub Hossin তাঁদের *The Strategy of Development in Bangladesh* গ্রন্থে বলেন:

The fragmentation of holding facilitates the reduction of risk by diversifying the elevation and type of polots in the land portfolio of the farmer, and by allowing him to grow different crops. It, however, reduces the productivity of labour makes labarer management more difficult and acts as a constraint to private investment on lumpy irrigation equipment and other forms of mechanization by large farmers.<sup>17</sup>

বাংলাদেশের কৃষির ভূমিবিদ্যাস প্যাটার্ন হতে স্পষ্ট যে, প্রায় ৯৭.৫% খামারের জমির পরিমাণ ৭.৫ একরের কম এবং দেশের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ৮৩% এই খামারসমূহের আওতায় রয়েছে।<sup>১৮</sup> যদি ১৯৭২ সালের ভূমি সংস্কার আইন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হত, তবে বাংলাদেশে বর্তমানে অতি সামান্য সংখ্যক খামারই ভূমি রাজস্ব দেয়ার



সারণি ০৩: কৃষিখামার চাষ ব্যবস্থাপনা (মোট খামারের শতকরা হার) [১৯৫১, ১৯৭৮, ১৯৯৬]

| ধরন                     | ১৯৫১ | ১৯৭৮  | ১৯৯৬  |
|-------------------------|------|-------|-------|
| ভূমিমালিক-কাম-চাষী      | ৪১   | ৬৪.৫৩ | ৬৬.২৩ |
| ভূমিমালিক-কাম-বর্গাচাষী | ৪৭   | ২৮.০৬ | ২৩.৫৯ |
| বর্গাচাষী               | ১২   | ৭.৪১  | ১০.১৮ |
| মোট                     | ১০০  | ১০০   | ১০০   |

সূত্র: Mosharraf Hossain, *Agriculture in Bangladesh*, p-131; BBS, *Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh 1998*, p-231 [Worked out from data given in the Yearbook]

বাংলাদেশের কৃষির ভূমিবিদ্যাস প্যাটার্নের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এখানে বৃহৎ খামার হিসেবে স্বীকৃত খামারসমূহ প্রতিবেশী দেশসমূহের বৃহৎ খামারের তুলনায় শুধু ছোটই নয়, খামারের আওতাভুক্ত জমি অনেক ছোট ছোট হোল্ডিং বা প্লটে বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন স্থানে বিন্যস্ত (scattered) যা যৌক্তিকভাবেই ছোট হোল্ডিং বা প্লটসমূহকে অর্থনৈতিক বিচার অলাভজনক খামারের পরিণত করে। এক হিসেবে দেখা যায় বাংলাদেশে খামারপিছু ছোট হোল্ডিং এর গড় সংখ্যা ৯.৬।<sup>১৬</sup> বাংলাদেশে বর্তমানে ৭.৫০ একরের খামারকে বৃহৎ খামার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়, অথচ ১৯৭২ সালের ভূমি সংস্কার আইন ৮.৩ একর (২৫ বিঘা) পর্যন্ত খামারকে ভূমি রাজস্ব প্রদান হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল, কারণ ২৫ বিঘা আয়তন পর্যন্ত খামারকে তখন উদ্বৃত্ত খামার হিসেবে মনে না করে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ খামার মনে করা হত। ১৯৭৭ সালের কৃষি শুমারী হতে দেখা যায় দুই-পঞ্চমাংশ খামারের ক্ষেত্রে ১০ এর অধিকবার খণ্ডীভবন হয়েছে এবং এক-চতুর্থাংশ খামারের ক্ষেত্রে এ খণ্ডীভবন হয়েছে ৬ বার থেকে ১০ বার। কৃষিজমির এই অব্যাহত খণ্ডীভবনের প্রভাব সম্পর্কে Azizur Rahman Khan and Mahbub Hossain তাঁদের *The Strategy of Development in Bangladesh* গ্রন্থে বলেন:

The fragmentation of holding facilitates the reduction of risk by diversifying the elevation and type of polots in the land portfolio of the farmer, and by allowing him to grow different crops. It, however, reduces the productivity of labour makes labarar management more difficult and acts as a constraint to private investment on lumpy irrigation equipment and other forms of mechanization by large farmers.<sup>17</sup>

বাংলাদেশের কৃষির ভূমিবিদ্যাস প্যাটার্ন হতে স্পষ্ট যে, প্রায় ৯৭.৫% খামারের জমির পরিমাণ ৭.৫ একরের কম এবং দেশের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ৮৩% এই খামারসমূহের আওতায় রয়েছে।<sup>১৮</sup> যদি ১৯৭২ সালের ভূমি সংস্কার আইন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হত, তবে বাংলাদেশে বর্তমানে অতি সামান্য সংখ্যক খামারই ভূমি রাজস্ব দেয়ার



উপযোগী বলে বিবেচিত হত। অন্যভাবে বলা যায়, সরকারিভাবেই সামান্য পরিমাণ খামার উদ্বৃত্ত খামার হিসেবে স্বীকৃতি পেত। বর্তমানে যে মাত্রায় জমির খণ্ডীভবন হচ্ছে তা বন্ধ হওয়ার বা নিদেনপক্ষে শুল্ক হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে সরল গাণিতিকভাবেই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশে বাস্তবিক অর্থে কোন বৃহৎ খামারের অস্তিত্ব থাকবে না এবং পাশাপাশি বিদ্যমান খামারসমূহের বেশিরভাগই পরিণত হবে অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক ও অকেজো খামারে।<sup>১৯</sup>

### বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন

১৯৬০ এর দশকের শেষদিকে বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল বছরে গড়ে প্রায় ১৫ লাখ মে. টন, অর্থাৎ নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি নিয়ে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও ১৯৭৪ সালের প্রলয়ংকরী বন্যা বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি আরো বাড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতার অব্যবহতি পরে তাই খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিই কৃষি উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৮০-র দশকের পর হতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকারিভাবে নিজেকে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে ঘোষণা করে (সারণি ০৪ দ্রষ্টব্য)।

#### সারণি ০৪: প্রধান খাদ্যশস্য (ধান ও গম) উৎপাদনের মোট পরিমাণ (মিলিয়ন টনে)

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ১৯৬০ | ৮৬/৮৭ | ৯৩/৯৪ | ৯৪/৯৫ | ৯৫/৯৬ | ৯৬/৯৭ | ৯৭/৯৮ | ৯৮/৯৯ | ৯৯/০০ | ০০/০১ | ০১/০২ | ০২/০৩ | ০৩/০৪ |
| ১১.৫ | ১৫.৭  | ১৯.১৭ | ১৮.০৮ | ১৯.০৬ | ২০.৩৪ | ২০.৬৬ | ২১.৮১ | ২৪.৯১ | ২৬.৭৬ | ২৫.৯১ | ২৬.৭০ | ২৭.৪৪ |

বিবিএস, 1998 Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh p-45; Ministry of Finance, Bangladesh Arthanaitik Samikkha 2002, p-48; Bangladesh Arthanaitik Samikka 2005, p-69

কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবী সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আনয়ন (খাদ্য সাহায্য ও আমদানী উভয়) হ্রাস পায়নি। মোট বিদেশী খাদ্যশস্যের মধ্যে খাদ্য সাহায্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পেলেও আমদানি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণি ০৫ দ্রষ্টব্য)। স্পষ্টতই খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে আমদানি-নির্ভরতা বাড়ছে। অবশ্য মনে রাখতে হবে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী রাষ্ট্রও সর্বদা বিশেষ ধরনের ভোক্তাদের জন্য কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করে থাকে বলে কোন দেশেই সাধারণত খাদ্য আমদানী একেবারে বন্ধ হয় না। বাংলাদেশে ২০০০-২০০১ অর্থ বছর হতে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর পর্যন্ত খাদ্য সাহায্য যেখানে অর্ধেক নেমে এসেছে সেখানে খাদ্য আমদানি বেড়েছে দ্বিগুণ, যা খাদ্যশস্য উৎপাদন ক্ষেত্রে এক ধরনের সংকটের প্রমাণ।



## সারণি ০৫: বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানির হিসাব (হাজার মেট্রিক টন)

| বছর                           | খাদ্য<br>সাহায্য | আমদানি | মোট  |
|-------------------------------|------------------|--------|------|
| ২০০০-০১                       | ৪৯১              | ১০৬৩   | ১৫৫৪ |
| ২০০১-০২                       | ৫০৯              | ১২৮৯   | ১৭৯৯ |
| ২০০২-০৩                       | ২৫৪              | ২৯৬৬   | ৩২২০ |
| ২০০৩-০৪                       | ২৮৯              | ২৪৯৯   | ২৭৯৮ |
| ২০০৪-০৫(১৬ এপ্রিল<br>পর্যন্ত) | ২৪৭              | ২৬০১   | ২৮৪৮ |

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫, পৃ-২৪৪

দানাদার খাদ্যশস্য (cereal foodcrops) উৎপাদন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলেও ১৯৭৪-৭৫ হতে ১৯৮৪-৮৫ পর্যন্ত অদানাদার খাদ্যশস্য (non-cereal foodcrops) যেমন ডাল, দুধ, তৈল জীব এবং শাক-সবজি উৎপাদন ও মাথাপিছু ভোগ আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পায়। অবশ্য ১৯৯০-র দশক হতে মাথাপিছু খাদ্যভোগ পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি লক্ষ করা যায় (সারণি ০৬)।

## সারণি ০৬: কিছু নির্দিষ্ট খাদ্য সামগ্রীর বার্ষিক মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ (কিলোগ্রাম)

| খাদ্য সামগ্রী           | ১৯৭৪/৭৫ | ১৯৮৪/৮৫ | ১৯৯৫/৯৬ | ১৯৯৮/৯৯ |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| দানাদার<br>খাদ্যশস্য    | ১৫৩.১৪  | ১৬৮.৭৭  | ১৭৫.৩   | ১৯৮.১   |
| আলু ও মিষ্টি আলু        | ২০.৫৫   | ১৭.৩২   | ১৪.৯    | ২৩.০    |
| ডাল                     | ২.৬৮    | ১.৯১    | ৪.৫     | ৪.১     |
| ভোজ্য তৈল               | ১.২৪    | ১.০৪    | ৫.৪     | ৫.৫     |
| চিনি                    | ১.২৮    | ১.০৭    | ২.২     | ২.৪     |
| দুধ ও দুগ্ধজাত<br>খাদ্য | ৯.৫৯    | ৮.৮     | ১০.১    | ১৩.২    |

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান প্যাকেট বই-২০০০, পৃ- ৩৮৯-৩৯২ এবং অনুপম সেন,  
বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ, পৃ-৭৭

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মাথাপিছু দৈনিক গড় ক্যালরি গ্রহণের প্রমিত মাত্রা অনু্যন ২০২০ হতে ২১৫০ কিলোক্যালরি<sup>৩০</sup> এবং এই ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণি ০৭ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য এ ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধিকে আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা করা যায়, কারণ মোট উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলেও কিছু নির্দিষ্ট খাদ্য সামগ্রীর মাথাপিছু ভোগ তথা প্রাপ্তি বেড়েছে। মূলত মুক্ত রাজার অর্থনীতির বদৌলতে অবাধ আমদানীর কারণে মাথাপিছু গড় খাদ্য প্রাপ্তি ধীরে ধীরে বাড়ছে, যদিও সে তুলনায় ক্যালরি গ্রহণের মাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না।



## সারণি ০৭: মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ

| জরীপ বর্ষ | জাতীয় | পল্লী  | শহর    |
|-----------|--------|--------|--------|
| ১৯৮৫-৮৬   | ২১৯১   | ২২০৩   | ২১০৭   |
| ১৯৮৮-৮৯   | ২২১৫   | ২২১৭   | ২১৮৩   |
| ১৯৯১-৯২   | ২২৬৬   | ২২৬৭   | ২২৫৮   |
| ১৯৯৫-৯৬   | ২২৫৪.০ | ২২৬৩.১ | ২২০৮.১ |
| ২০০০      | ২২৪০.৩ | ২২৬৩.২ | ২১৫০.০ |

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৩, পৃ-১২৭

বাংলাদেশে অদানাদার খাদ্যশস্যের মাথাপিছু গড় উৎপাদন কমলেও সেসব খাদ্যের মাথাপিছু গড় প্রাপ্তি বা গড় ভোগ হ্রাস না পাওয়ার মূল কারণ অবাধ আমদানী। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শর্তানুযায়ী অবাধ আমদানীর কারণে দেশজ কৃষিপণ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উন্নত দেশসমূহ কৃষিখাত যে পরিমাণ ভর্তুকি দেয় বিশ্ব ব্যাংক, আই.এম.এফ.সহ বিভিন্ন সংস্থা ও দেশের চাপে বাংলাদেশ সে পরিমাণ ভর্তুকিতো দিতেই পারে না ১৯৮০-র দশক হতে কৃষি ভর্তুকি বিপুল অংশে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ফলে বাংলাদেশে কৃষির উৎপাদন খরচ বেশি অথচ কৃষিপণ্যের মূল্য সে তুলনায় কম, অর্থাৎ কৃষি বাস্তবিক অর্থেই একটি অলাভজনক খাত। এমনকি প্রতিবেশী এশীয় দেশসমূহের তুলনায়ও বাংলাদেশে কৃষির উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি। স্বাভাবতই দেখা যায় যে, আমদানীকৃত কৃষিপণ্য দেশজ কৃষিপণ্যের তুলনায় সস্তা। এমনভাবেই দেশজ কৃষিপণ্য অবাধ বাণিজ্যের যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (IRRI) বিশেষজ্ঞ ড. মাহবুব হোসেন দেখিয়েছেন যে, একজন বাংলাদেশী কৃষককে যেখানে প্রতি হেক্টর জমিতে সেচ বাবদ ব্যয় করতে হয় ৫১ ইউএস ডলার, সেখান ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের কৃষককে ব্যয় করতে হয় ১৮ ইউএস ডলার, পাঞ্জাব প্রদেশের কৃষককে ব্যয় করতে হয় ৩২ ইউএস ডলার, থাইল্যান্ডের কৃষককে ব্যয় করতে হয় ১৮ ইউএস ডলার আর ভিয়েতনামী কৃষককে ব্যয় করতে হয় ২৬ ইউএস ডলার।<sup>২১</sup> কৃষিতে তুলনামূলক অধিক উৎপাদন ব্যয় এবং পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয়ের ক্রমবৃদ্ধি বাংলাদেশের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনে একটি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে, যার প্রভাব ইতোমধ্যেই অনুভূত হতে শুরু করেছে। সমাজবিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন তাঁর বাংলাদেশঃ রাষ্ট্র ও সমাজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এমনভাবেই বাংলাদেশের অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক আধুনিক চাষাবাদের খরচ যোগান দিতে ব্যর্থ হয়ে গতানুগতিক চাষাবাদে ফিরে যাচ্ছে।<sup>২২</sup> ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে, ১৯৯০-র দশকে প্রতিবেশী দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক দ্রুততার সাথে বাণিজ্য উদারীকরণের পথে অগ্রসর হয়েছে। ফলে আমদানীকৃত কৃষিপণ্যের সাথে দেশজ কৃষিপণ্য টিকে থাকতে ব্যর্থ হচ্ছে। বাংলাদেশের সরিষা আমদানীকৃত সয়াবিনের দাপটে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। পাশাপাশি আদা, পিঁয়াজ, রসুন, ডাল, বিবিধ মসলা ইত্যাদির উৎপাদন আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এসব শস্যের উৎপাদনই শুধু কমেনি বরং এসব শস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কৃষি জমির মোট পরিমাণও দ্রুত কমছে (সারণি ০৮ দ্রষ্টব্য)। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের বাজেটে সরকার আদা,



পিঁয়াজ, রসুন, ডাল ও বিবিধ মসলা উৎপাদনের জন্য কৃষকদেরকে মাত্র ২% সুদে কৃষি ঋণ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।<sup>২৩</sup> অত্যন্ত উদ্বেগজনক তথ্য হচ্ছে, বাংলাদেশ ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে বৈধ পথে মশলা আমদানি করেছে ৫৩৮ কোটি টাকার, তন্মধ্যে শুধু পেঁয়াজ আমদানিতে ব্যয় হয়েছে ৪৫০ কোটি টাকা।<sup>২৪</sup> এছাড়াও জিরা, গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, জায়ফল, ধনিয়া ইত্যাদি মসলার আমদানি খরচও দ্রুত বাড়ছে। অবৈধ পথে আমদানির কোন হিসেব অবশ্য পাওয়া যায় না। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে পেঁয়াজসহ অন্যান্য মসলা আমদানিতে এই বিপুল ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিঃসন্দেহ কৃষিখাতে বড় ধরনের বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবাহী। এছাড়াও বাংলাদেশের অন্যতম কৃষিপণ্য পাটের উৎপাদন অত্যন্ত শোচনীয়। দেশের বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিলস বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষাপটে পাটের সামগ্রিক উৎপাদন ও বিপণন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

### সারণি ০৮: কতিপয় কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ

(হাজার একর, হাজার মেট্রিক টন)

| বছর     | ডাল  |        | তৈলবীজ |        | মশলা |        | ইক্ষু |        | পাট  |        | গোল আলু |        |
|---------|------|--------|--------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|---------|--------|
|         | একর  | উৎপাদন | একর    | উৎপাদন | একর  | উৎপাদন | একর   | উৎপাদন | একর  | উৎপাদন | একর     | উৎপাদন |
| ১৯৯৪/৯৫ | ১৭৫৫ | ৫৩৪    | ১৩৮১   | ৪৮০    | ৩৫৪  | ৩১৮    | ৪৪৫   | ৭৪৪৬   | ১৩৩৩ | ৯৬৬    | ৩২৫     | ১৪৬৮   |
| ১৯৯৫/৯৬ | ১৭২৫ | ৫২৫    | ১৩৭০   | ৪৭১    | ৩৫৩  | ৩১৮    | ৪৩১   | ৭১৬৫   | ১১৩৩ | ৭৩৯    | ৩২৭     | ১৪৯২   |
| ১৯৯৬/৯৭ | ১৭১৫ | ৫২৮    | ১৩৭০   | ৪৮৮    | ৩৫৫  | ৩২০    | ৪৩৪   | ৭২২০   | ১২৫৩ | ৮৮৩    | ৩৩১     | ১৫০৮   |
| ১৯৯৭/৯৮ | ১৫৯০ | ৫১৯    | ১৩৬৬   | ৪৮৩    | ৩৫৫  | ৩১৬    | ৪৩৩   | ৭৩৭৯   | ১৪২৭ | ১০৫৭   | ৩৩৭     | ১৫৫৩   |
| ১৯৯৮/৯৯ | ১৩৫১ | ৪১৭    | ১২৬৪   | ৪৪৮    | ৩২১  | ৩৯৫    | ৪৩০   | ৬৯৫১   | ১১৮১ | ৮১১    | ৩০৫     | ২৭৬২   |
| ১৯৯৯/০০ | ১২৩১ | ৩৮৩    | ১০৭৯   | ৪০৬    | ৬২৩  | ৪০৬    | ৪২১   | ৬৯১০   | ১০০৮ | ৭১১    | ৬০১     | ২৯৩৩   |
| ২০০০/০১ | ১১৭০ | ৩৬৬    | ৯৪৮    | ২৯২    | ৫৮৮  | ৩৯৭    | ৪১৭   | ৬৭৪২   | ১১০৭ | ৮২১    | ৬১৫     | ৩২১৬   |
| ২০০১/০২ | ১১১৬ | ৩৪২    | ৯০৯    | ২৮৫    | ৬২২  | ৪১৭    | ৪০২   | ৬৫০২   | ১১২৮ | ৮৫৯    | ৫৮৭     | ২৯৯৪   |
| ২০০২/০৩ | ১১০৮ | ৩৪৯    | ৮৯৭    | ২৭৭    | ৬২৫  | ৪২৫    | ৪১০   | ৬৮৩৮   | ১০৭৯ | ৮৩০    | ৬০৬     | ৩৩৬৬   |
| ২০০৩/০৪ | ১০৯৯ | ৩৩৩    | ৮৫০    | ২৭০    | ৬৬৭  | ৬০৮    | ৪০৪   | ৬৪৮৪   | ১০০৮ | ৭৯৪    | ৬৬৯     | ৩৩০৭   |

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫, পৃ-২৪৩

সারণি ০৪ ও ০৮ হতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য শস্যের উৎপাদন প্রকৃতঅর্থে হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন দানাদার খাদ্যশস্য বিশেষত ধান ও গম উৎপাদনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ায় অদানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। স্বাধীনতার তিন দশক পরেও শুধু কৃষিপণ্য আমদানী করতেই বাংলাদেশকে প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হচ্ছে। বস্তুত স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বলতে বোঝানো হয়েছে ধান, গম ইত্যাদি উৎপাদন। তাই দেখা যায় বাংলাদেশে মোট আবাদী জমির প্রায় ৭২.৮১%-ই ধান চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়।<sup>২৫</sup>

### কৃষি উৎপাদনের সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন মূলত তিনটি ভৌত উপাদানের উপর নির্ভরশীল: কৃষিজমির পরিমাণ, মৃত্তিকার গুণাগুণ ও পানি। উর্বর মৃত্তিকা, প্রচুর বৃষ্টিপাত, ভূপৃষ্ঠস্থ মিঠাপানির বিশাল উৎস, সহজলভ্য ভূগর্ভস্থ পানি ইত্যাদি কারণে অনাদিকাল থেকেই বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। এ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণেই বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ।<sup>২৬</sup> আবার দেশের মোট ভূমি এলাকার তুলনায় মোট চাষযোগ্য



ভূমির (arable land) হিসেবেও বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে সর্বোচ্চ। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে ভৌত উপাদানের ক্ষেত্রে কৃষির সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধক মাথাপিছু কৃষিজমির স্বল্পতা, কারণ বিশ্বের যে কোন কৃষিভিত্তিক অঞ্চল অপেক্ষা জমি-মানুষ অনুপাত বাংলাদেশে সর্বনিম্ন। কৃষির অনুভূমিক সম্প্রসারণ (horizontal expansion of agriculture) তথা নতুন নতুন জমি কৃষি উৎপাদনের আওতায় আনার সুযোগ বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। অধিকন্তু অব্যাহত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে জমি-মানুষ অনুপাত প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে নগরায়ন, শিল্পায়ন, সড়ক, স্কুল-কলেজ-বাড়িঘর নির্মাণ ও নদীভাঙ্গনের কারণে প্রতি বছর প্রায় ১% কৃষিজমি অকৃষিজ কাজের আওতায় চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ বছরে প্রায় এক লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি হারিয়ে যাচ্ছে (depletion of croplands) এবং ফলশ্রুতিতে স্বল্প জমিতে অধিক মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদনের এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ।<sup>২৭</sup> উন্নত ইউরোপীয় দেশের ন্যায় (যেমন- নেদারল্যান্ডস) সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধার (land reclamation) করে কৃষির অনুভূমিক সম্প্রসারণ করা আর্থিক ও কারিগরী উভয় কারণেই বর্তমান প্রেক্ষাপটে হয়তো বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সেচ সম্প্রসারণ এবং সার, বীজ, উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষির উল্লম্ব সম্প্রসারণই (vertical expansion of agriculture) বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন সমস্যার সমাধান করতে পারে। নীট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ও মোট ভূমি এলাকার মধ্যে নীট চাষযোগ্য জমির শতকরা হারের সরকারি হিসেবেও কৃষিজমি হারিয়ে যাওয়ার সমস্যাকে স্বীকার করা হয়েছে, যদিও হারিয়ে যাওয়া কৃষিজমির পরিমাণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মোট ভূমি এলাকার মধ্যে নীট চাষযোগ্য ভূমির ক্রমহ্রাসমানতার সমস্যা মোকাবেলায় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে শস্য-নিবিড়তা (cropping-intensity) ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮১/৮২ সালে মোট ভূমি এলাকার মধ্যে নীট চাষযোগ্য ভূমি ছিল শতকরা ৬৫.৬৩ ভাগ, যা দুই দশক পরে ২০০১/০২ সালে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫৭.১৪ ভাগে; একই সময়ে শস্য নিবিড়তা ১৫৩.৮৪ হতে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৬.৯৮ (সারণি ০৯ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ০৯: বাংলাদেশে শস্য নিবিড়তার প্রবণতা (এলাকা মিলিয়ন হেক্টরে)

| বছর     | দেশের মোট ভূমি এলাকা | নীট চাষযোগ্য ভূমি | মোট ভূমি এলাকার মধ্যে নীট চাষযোগ্য ভূমির শতকরা হার | শস্য নিবিড়তা |
|---------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| ১৯৮১-৮২ | ১৪.২৯                | ৯.৩৮              | ৬৫.৬৩                                              | ১৫৩.৮৪        |
| ১৯৯১-৯২ | ১৪.৮৪                | ৯.০৯              | ৬১.২৫                                              | ১৭৩.০২        |
| ২০০১-০২ | ১৪.৮৪                | ৮.৪৮              | ৫৭.১৪                                              | ১৭৬.৯৮        |

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫, পৃ-৬৯

প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, কৃষিজমির অব্যাহত খণ্ডীভবন ও অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির খামার ও হোল্ডিংয়ের কারণে কৃষি উৎপাদন অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক বিবেচিত হওয়ায় এবং বিদ্যমান ভূমি আইনের (উত্তরাধিকার, হস্তান্তর ইত্যাদি) জটিলতা ইত্যাদি কারণে কৃষিজমির উল্লম্ব উৎপাদন সম্প্রসারণ কাজিষ্কৃত মাত্রায় সম্ভব হচ্ছে না। মনে রাখতে হবে, সাধারণত



বৃহৎ খামারের মালিক তথা ধনী কৃষকরাই তাদের জমিতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাসম্পন্ন কৃষি উৎপাদন করতে পারে, যেহেতু কেবলমাত্র তাদের হাতেই বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি থাকতে পারে। অধিকন্তু ঋণ প্রদানকারী রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ধনী কৃষকদেরকেই বেশি ঋণ দেয় কারণ ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা ও ভূমির উপর বৈধ দখলদারিত্ব প্রমাণের ক্ষমতা তাঁদেরই বেশি। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের পক্ষে ব্যয়বহুল আধুনিক চাষাবাদ, সেচ যন্ত্র স্থাপন বা উন্নত বীজ ব্যবহার আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণেই সম্ভব নয়, অথচ বাংলাদেশের সিংহভাগ কৃষকই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। এছাড়াও প্রচলিত বর্গাচাষ পদ্ধতিতে জমির মূল মালিক যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষি উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না, সেহেতু বর্গাচাষীদের পক্ষে এককভাবে কৃষিতে ব্যয়বহুল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রায়শই সম্ভব হয়ে ওঠে না। অথচ বাংলাদেশের ১,৭৭,৭১,৩৩৯ একর কৃষি জমির মাত্র ৪৮.৩১% তথা ৮৫,৮৬,২২২ একর জমি সেচের আওতায় রয়েছে।<sup>২৮</sup> যেহেতু অর্ধেকের বেশি কৃষিজমি সেচের আওতার বাইরে রয়েছে সেহেতু শুধু সেচ সম্প্রসারণই যৌক্তিক অর্থে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম। কিন্তু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ট ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদেরকে সেচ সম্প্রসারণ সুবিধার আওতায় আনা বর্তমান কৃষি কাঠামো ও ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত অর্থেই এক অসম্ভব কাজ। আসহাবুর রহমান তাঁর বাঙলাদেশের কৃষিকাঠামো, কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেন, “অধিকাংশ ক্ষুদ্র চাষীরই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আধুনিক কৃষি উপকরণ ব্যবহার করতে উৎসাহী নয় প্রধানত দুটো কারণে। কারণ দুটো হচ্ছে (১) মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে কৃষি উপকরণ ক্রয় করা লাভজনক নয় কারণ ঋণের সুদ খুব চড়া; (২) আধুনিক কৃষি উপকরণের সাহায্যে চাষ করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কারণ এগুলোর সরবরাহ তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।”<sup>২৯</sup> বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৭% (২০০১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী), যা আগামী বছরগুলোতে স্থির থাকলে বা কিছুটা হ্রাস পেলেও অত্যন্ত ব্যাপক জনসংখ্যা ভিত্তির (wide population base) কারণে প্রতিবছর গড়ে ২০ লক্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। জনসংখ্যার অভিক্ষেপ হতে দেখা যায় যে ২০২০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ১৭৩ মিলিয়ন এবং তখন বর্তমানের চেয়ে ২০ লক্ষ হেক্টর কম জমিতে বর্তমানের চেয়ে অতিরিক্ত ৫ থেকে ৬ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে।<sup>৩০</sup> সে সময় এ সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য ও উপায় হতে পারে যে কোন মূল্যে সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং অকৃষিজ কাজে কৃষিজমির অব্যাহত ব্যবহারকে আইন করে নিয়ন্ত্রণ করা।

### উপসংহার

বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম সমস্যা হচ্ছে যেভাবে কৃষিজমির খণ্ডীভবন হচ্ছে তাতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা কৃষিতে বিনিয়োগের ক্ষমতা আক্ষরিক অর্থেই হারিয়ে ফেলছে। অথচ বাংলাদেশে কৃষিখামারের আওতাধীন জমির পরিমাণ বা কৃষিখামারের সংখ্যার নিরিখে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এমন ধারণা পোষণ করা অত্যন্ত অমূলক যে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষিতে বিনিয়োগের ক্ষমতা বৃদ্ধি না করেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কারণ, মনে রাখতে হবে কৃষি উৎপাদন যতটা না প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা নির্ভর তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমি বন্টন, প্যাটার্ন, উত্তরাধিকার ও ভূমি ব্যবহার প্রসঙ্গটি। আসহাবুর রহমানের ভাষায় “শস্য বাড়ানোর আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি যেমন নিয়ন্ত্রিত সেচ, উফসী বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যাপকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব



কিন্তু কৃষি খামারের বিরাজমান আয়তন ও জোতগুলোর অসংখ্য টুকরোয় খণ্ডিত থাকার ফলে খুব অল্পসংখ্যক কৃষকের পক্ষেই এসব মূলধনঘন প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।<sup>৩১</sup> অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে (বাংলাদেশ সরকার যে ধারণার সমর্থনে সম্প্রতি বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে) জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু তারা হয় একটি বিষয় অনবহিত বা গুরুত্বহীন মনে করছেন তা হচ্ছে উৎপাদক তথা কৃষকের কৃষিতে বিনিয়োগ ক্ষমতার প্রসঙ্গ। যদি কৃষকের কৃষিতে বিনিয়োগের মত যথেষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ক্ষমতা না থাকে তাহলে জৈব প্রযুক্তি বা অন্য কোন প্রযুক্তির মাধ্যমেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা অনেক কম। স্পষ্টতই কৃষি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত। বাংলাদেশের কৃষি মূলত আত্মপোষণমূলক কৃষি (subsistence agriculture), উদ্বৃত্ত কৃষি (surplus agriculture) নয়। এখানে বেশিরভাগ কৃষকই সাধারণত বাজারের জন্য বা মুনাফার জন্য কৃষি উৎপাদন করেনা তাই উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা খুব কম কৃষকেরই আছে। বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থে কোন জোতদার নেই এবং বৃহৎ কৃষকদের (যাদের প্রায়শই জোতদার বলে সাধারণ্যে চিত্রিত করা হয়) আর্থিক সঙ্গতি এমন যে তাঁদের অনেকেই কৃষি ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যও নেই। এসব কৃষক কিভাবে ব্যয়বহুল জৈব-প্রযুক্তির জন্য বিনিয়োগ করবে তা বোধগম্য নয়। সমাজ বিবর্তনের প্রতিটি ধাপেই প্রযুক্তি ও পুঁজির সমাবেশ ঘটে। অনেক প্রযুক্তিই সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃটেনের হাতে ছিল কিন্তু পুঁজির অভাবে সেগুলো কার্যকর করা যায়নি, কিন্তু ভারতকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে বৃটেনের পুঁজির সমস্যা মিটে যাওয়ার পরই মূলত প্রযুক্তি ও পুঁজির সম্মিলনে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়।<sup>৩২</sup> অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা যায় বাংলাদেশের কৃষি সাফল্য নির্ভর করছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ট দরিদ্র ও উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে অক্ষম ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যয়বহুল জৈব-প্রযুক্তির জন্য বিনিয়োগ করার সক্ষমতার উপর। কিন্তু বিরাজমান ভূমি বন্টন প্যাটার্ন, উত্তরাধিকার ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থার পরিপেক্ষিতে ক্ষুদ্র কৃষকদের পক্ষে কৃষিতে জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করা হয়তো সম্ভব নয়।

তাছাড়া আইন করে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় যদি কৃষিজমিকে অকৃষিজ কাজে অব্যাহতভাবে ব্যবহারের প্রবণতা অনতিবিলম্বে বন্ধ করা না যায়, তবে কৃষিজমির পরিমাণ আগামী দুই দশকের মধ্যে এতটাই কমে যাবে যে সে সময়ের জনসংখ্যার কৃষিজ চাহিদা মেটানো ঐ কৃষিজমির দ্বারা সম্ভব হবে না। সুতরাং বাংলাদেশের কৃষির সর্বপ্রধান কাঠামোগত সমস্যা দুটো -- প্রথমতঃ জমির অব্যাহত খণ্ডীভবন বন্ধ করতে তথা কৃষিজমির অর্থনৈতিক ভাবে অলাভজনক হোল্ডিং-এ পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে উত্তরাধিকার আইন বা সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কৃষিজমিকে লাগামহীনভাবে অকৃষিজ কাজে ব্যবহারের প্রবণতা বা প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে, অর্থাৎ ভূমি ব্যবহার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যাতে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত না হয়। এছাড়াও নদী ভাঙ্গন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে করে কৃষিজমি রক্ষা করা যায়। কৃষিজমির খণ্ডীভবন আর কৃষিজমির বিলীমানতা রোধ করতে না পারলে যত প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হোক না কেন বাংলাদেশের কৃষি ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে বাধ্য। আর এটাই বর্তমান শতাব্দীতে কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়কারী চ্যালেঞ্জ।



তথ্য সূত্র

- <sup>১</sup> অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ সরকার), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫, ঢাকা জুন ২০০৫, পৃ-৬৭
- <sup>২</sup> প্রাপ্ত, পৃ-৬৭
- <sup>৩</sup> বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০০০, ঢাকা, ২০০২, পৃ-১৬৭
- <sup>৪</sup> প্রাপ্ত, পৃ-১৯৩
- <sup>৫</sup> প্রাপ্ত, পৃ-১৭৮-১৭৯
- <sup>৬</sup> আসহাবুর রহমান, বাংলাদেশের কৃষিকাঠামো, কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬, পৃ-১১
- <sup>৭</sup> B K Jahangir, *Differentiation, Polarisation and Confrontation in Rural Bangladesh*, CSS, Dhaka, 1979, p-33
- <sup>৮</sup> Mosharraf Hossain, *Agriculture in Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka, 1991, p-128
- <sup>৯</sup> প্রাপ্ত, পৃ-১২৮
- <sup>১০</sup> প্রাপ্ত, পৃ-১২৯
- <sup>১১</sup> দৈনিক যুগান্তর, ২৩ মে, ২০০৬, পৃ-৩
- <sup>১২</sup> বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *The Bangladesh Census of Agriculture and Livestock-1983-84*, p-46; *Statistical Pocketbook of Bangladesh 2000*, pp-178
- <sup>১৩</sup> যেমন অত্র প্রবন্ধে ৭.৫ একর বা তদূর্ধ্ব পরিমাপের খামারকে বৃহৎ খামার হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও ১৯৭২ সালের সরকারী আদেশে ৮.৩ একর (২৫ বিঘা) পর্যন্ত কৃষি জমিকে খাজনামুক্ত ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ ৮.৩ একর পর্যন্ত খামারকে তখন বৃহৎ খামার হিসেবে গণ্য করা হতো না। হোসেন জিল্লুর রহমান এবং মাহবুব হোসেন তাঁদের *Rethinking Rural Poverty* (UPL, Dhaka, 1995, p-32) গ্রন্থে চার ধরনের খামারের কথা বলেছেন কার্যত ভূমিহীন (০-৫০ একর); ক্ষুদ্র খামার (.৫০- ২.৪৯); মাঝারি খামার (২.৫০-৪.৯৯ একর); এবং বৃহৎ (৫.০+একর)। আবার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৫ (পৃ-১৬৬) তে নতুন সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে: ক্ষুদ্র খামার (.৫০-২.০০ একর); মাঝারি খামার (২.০০-৫.০০ একর) এবং বৃহৎ খামার (৫+একর)
- <sup>১৪</sup> Mosharraf Hossain, *Agriculture in Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka, 1991, p-128 and বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২, ঢাকা জুন ২০০২, p-121



- ১৫ Abdul Bayes, 'Green Revolution: Dialectics Old bedates and New Data', *The Daily Star*, 28.01.2003
- ১৬ আসহাবুর রহমান, বাংলাদেশের কৃষিকাঠামো, কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬, পৃ-২৫
- ১৭ Azizur Rahman Khan and Mahbub Hossain, *The Strategy of Development in Bangladesh*, Macmillan, London, 1989, p-34
- ১৮ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *The Bangladesh Census of Agriculture and Livestock-1983-84*, p-46 and statistical Pocketbook of Bangladesh 2000, pp-178-179
- ১৯ ১৯৭৭ ও ১৯৯৬ সালে বৃহৎ খামার ছিল মোট খামারের যথাক্রমে ৯.৪০% ও ২.৫২%। অর্থাৎ ২০ বছরে (১৯৭৭-১৯৯৬) ৭৩% বৃহৎ খামার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যদি এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে তবে স্বাভাবিক গাণিতিক নিয়মেই ২০০৫ সালের পর বাংলাদেশে প্রকৃতঅর্থে বৃহৎ খামার থাকার কথা নয়।
- ২০ বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশন মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি মাত্রা নির্ধারন করেছে অনূ্যন ২০২০ কিলোক্যালরি, অন্যদিকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এই মাত্রা নির্ধারন করেছে অনূ্যন ২১৫০ কিলোক্যালরি।
- ২১ Dr. Mahabub Hossain of Social Science Division, International Rice Research Institute (IRRI), presented the keynote paper in a dialogue on 'Liberalization of Crop Sector: Can Bangladesh Withstand Regional Competition' organized by The Centre for Policy Dialogue (CPD) on 08.01.2003 in Dhaka; *The Daily Star*, pp-11 & 12; 09.01.2003
- ২২ অনুপম সেন, বাংলাদেশঃ রাষ্ট্র ও সমাজ, অবসর, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ-৭৮
- ২৩ জাতীয় বাজেট প্রস্তাব ২০০৫-২০০৬ দ্রষ্টব্য
- ২৪ দৈনিক ইত্তেফাক, ০৭.০১.২০০৬, পৃ-১
- ২৫ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০০০, ঢাকা, ২০০২, পৃ-১৬৮
- ২৬ সিংগাপুর ও হংকং এর ন্যায় নগর রাষ্ট্র বাদ দিলে বাংলাদেশের প্রতি কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব বিশ্বে সর্বোচ্চ।
- ২৭ *The Daily Star*, 01.11.2003
- ২৮ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *1998 Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh, Dhaka*, p-222



- ২৯ আসহাবুর রহমান, বাংলাদেশের কৃষিকাঠামো, কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬, পৃ-২৫
- ৩০ The Daily Star, 01.11.2003
- ৩১ আসহাবুর রহমান, বাংলাদেশের কৃষিকাঠামো, কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬, পৃ-২৭
- ৩২ Anupam Sen, *The State Industrialization and Class formations in India*, Routledge & Kegan Paul, 1982, London, p-48